শিক্ষা সমাজ দেশ

সাম্প্রতিক বিপ্লবের প্রেক্ষিত ও আলোক-নির্দেশনা

– অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

সাম্প্রতিক বিপ্লব একটা আলোক-নির্দেশনা খুঁজে পেয়েছে; তাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, দেশকে সেদিকে চালিত করতে হবে। তাই সংস্কারের ট্রেনকে গন্তব্যে নেওয়াটাই যৌক্তিক হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারের কোনো মানে হয় না– সে সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারই করুক বা ভাবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারই করুক। তবে সংস্কারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতিপথ থাকতে হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারে দেশের বর্তমান অনুবিদ্ধ ও অন্তর্নিবিষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলোর তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। দেশ যেমন ছিল তেমনই থাকবে। শুধু মেগা-দুর্নীতি ও দেশবিক্রির ক্রমোন্নতি কমবে বলে আশা করা যায়। এতে রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অপকর্মের জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতা না থাকার সংস্কৃতি পূর্বের মতো বহাল থাকবে বলা যায়। সংস্কারকদের বিষয়টা নিয়ে ভাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছি। বিপ্লব শুধু ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে– একথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। বিপ্লব সীমাহীন দুর্নীতি-লুটপাট, গণতন্ত্রহীন নৈরাজ্য, ক্ষমতার অসহনীয় দাপট, অন্ধকার যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীন দেশকে অন্য দেশের শাসনের নিগড়ে বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি শতেক বহুমুখী কারণে সংঘটিত হয়েছিল। এতে ছাত্র-জনতাসহ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত, দমন-পীড়নে নিষ্পেষিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তবে বিপ্লব-পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতি আশানুরূপ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বিপ্লবের পূর্ণতা এখনো বাকি। তাই এ বিপ্লবকে কেউ কেউ গণঅভ্যুত্থান বলেই আপাতত তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনভিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে কারো কারো অপরিপক্ক বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের অপরিপূর্ণতা বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সেজন্যই বলতে হচ্ছে, বিপ্লব পূর্ণতা পায়নি। বিষয়টা দেশের স্বার্থে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদরা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে মানিয়ে নিতে পারতেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দেশের পুনর্বিন্যাস ও সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা সৃষ্টির সুযোগ এসেছিল, আমাদের অদূরদর্শীতার কারণে বা দলীয় স্বার্থবাদিতার কারণে বা প্রতিহিংসা চরিতার্থের কারণে আমরা তা কাজে লাগাতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তাই তেপ্পান্ন বছর দেশ উদ্দেশ্যহীনভাবে সংকীর্ণ গণ্ডিতে ঘুরপাক খেয়েছে। এবারও তেমনটি হলে সহজে আর এদেশ বাঞ্ছিত গতিপথে চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। এ আধা-বিপ্লবকে অন্যান্য পরিপক্ক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবে পরিণত করাই দেশের জন্য অনেক ভালো হতো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের রাজনৈতিক দল গড়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করেছে, অনেক রাজনৈতিক দলের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। একটা গানের কলি এরকম শুনেছিলাম, 'ভুল করে তুই বারে বারে করিস কেন ভুল, গলায় মালা পরলি যদি ছিঁড়িস কেন ফুল, ও তুই ছিঁড়িস কেন ফুল'। এছাড়াও কিছু উপদেষ্টা ও তাদের কায়েমি আস্থাভাজনদের প্রচ্ছন্ন সম্পৃক্ততা বিপ্লবের অভিমুখীতাকে পথভ্রষ্ট করছে। এতে লাভবান হচ্ছে ভারতের চিহ্নিত পোষা গোলাম– পতিত অপশক্তি। আমার দৃষ্টিতে আধাখেঁচড়া সংস্কার কেন্দ্রীয় দুরাচারবৃত্তি ও দুর্নীতি কিছুটা কমালেও দেশব্যাপী এলাকাভিত্তিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে।

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটা সুনির্দিষ্ট গতিপথ ও লক্ষ্য গড়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এটা সত্য, ছাত্র-জনতার এ বিপ্লব হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী এবং মুজিববাদী দেশবিনাশী অপশক্তিকে চিরবিদায় জানিয়ে দেশের জন্য স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত স্বাধীন দেশোপযোগী আদর্শকে বেছে নিতে চেয়েছে; যদিও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল চায়, অপশক্তি আবার ফিরে আসুক। আমার বক্তব্য পরিষ্কার– পাঁচ সন্তানের জননীর কুমারিত্ব পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর আর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

আরেকটা বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের বেশি বুঝতে হতো, হয়নি। ভাবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সরকারও বুঝতে চাইবে বলে মনে হয় না। এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও আলাদা অস্তিত্ব গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার আনার প্রয়োজন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমরা যেন মূলছিন্ন ও স্মৃতিভ্রষ্ট জাতি না হয়ে যায়। যে জাতি তার অতীতকে ভুলে যায়, সে জাতি নিঃস্ব। একমাত্র শিক্ষাই পারে উন্নত জাতিসত্তা গড়তে এবং দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে। এদেশে তা অবহেলিত। এজন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সরাসরি সম্পক্ততার বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে, সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (inclusive society) ও একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার (integrated education system) মডেল ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টার গুরুত্ব ও মডেল না বুঝলে এ কাজও অতীতের মতো পরিণামে ব্যর্থ হবে। যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তাতে সিলেবাসের এক-আধটু পরিবর্তন হলেও ভিত্তিস্তর, মান ও মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হবে না। শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের থেকে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে ছিলেন। তাই দেশে ফিরে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ত্যাগ বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন; যেমনটি অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে এদেশের কিছু কিছু রাজনীতিক চব্বিশের জুলাই-আগস্টের পৈশাচিক বিভীষিকা এবং গণমানুষ ও ছাত্র-জনতার জীবন-ত্যাগ ও হাজার হাজার ছাত্র-জনতার জীবন্মৃত আহাজারি ভুলে যেতে বসেছে। যে স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে জনসাধারণ একাত্তরে স্বাধিকার অর্জনে প্রাণপণ যুদ্ধে নেমেছিল, জীবন দিয়েছিল, শেখ মুজিব তা ভুলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধ এ দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ পরে বুঝেছিল, স্বাধীনতার নামে ভারত সরকার পাকিস্তানকে নিজস্বার্থে দু-ভাগ করে হাতের মুঠোই নিল। ভারত এ দেশকে আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন, একদলীয় বাকশালী শাসন, রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর প্রকাশ্য অত্যাচার, বিচারবহির্ভুত গুম-হত্যা ও নির্যাতন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে সুখ-শান্তির আশা ধূলিসাৎ করে দিল। শেখ মুজিব ও তার বাম-ঘরানার দোসররা এদেশের একত্ববাদী জনতাকে ভারতের বহুত্ববাদী ও বর্ণবৈষম্যবাদী সংস্কৃতির কাছে জিম্মি করে ফেলেছিলেন।

৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের সময়ে বাম দল রাষ্টপতি জিয়ার ঘাড়ে চেপে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। রাষ্টপতি জিয়ার আদর্শের সৈনিকদের এটা ভুলে গেলে চলবে না, তিনি বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে সামরিক আইন ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশকে ইসলামি ধারায় উন্নয়নের পথে পরিচালনা করেন। এর মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা থেকে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ও মুজিববাদ ব্যর্থ হয়ে কালের অতলে তলিয়ে যায়। বাকশালের উত্থান ও পতনও শেখ মুজিবের ঘাড়ে বাম কমরেডদের ভূত চেপে বসার কারণেই হয়েছিল। বর্তমানেও এদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে এদের একটা জোট প্রতিটা নীতিনির্ধারণী কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে, যারা প্রতিটা পর্যায়ে ভারতপ্রীতির স্বাক্ষর মনের অন্তস্তলে জাগিয়ে রাখে এবং তাদের বিধিমতো এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিলীনপ্রায় বস্তুবাদী ও ধর্মহীন চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চায় এবং ইসলাম-ফোবিয়র কারণে ইসলামি একত্ববাদের নীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংস নীতির প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারে না। মানবজাতিকে নিছক একটা ভোগবাদী প্রাণি হিসেবে গণ্য করতে চায়। এদের একটা অংশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দিশারীদেরও প্রভাবিত করতে চায়। সম্প্রসারণবাদী বহিঃশক্তিকে কৌশলে সময় নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জায়গা করে দিতে চায়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে ধর্মহীন চেতনার মনজাগতিক দ্বন্দ্ব ও মতভিন্নতার অস্তিত্ব সামনে চলে আসতে পারে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতাসীন দলের পরিচালকদের অতি সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে এবং ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে দলীয়

নীতিমালা নির্ধারণ সুস্পষ্ট করতে হবে। এটা কোনো বিপ্লবের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। আমরা কেউ কেউ শুধু খুঁজে খুঁজে বাম-রাজনীতির বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যকে প্রচারের জন্য সামনে নিয়ে আসি। এছাড়াও বিশ্বে অসংখ্য বিপ্লব হয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা অনবহিত অথবা সে বিষয়ে পড়াশুনা কম। এ বিশ্বে শতেক রকমের মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। সময় অতিক্রমনে অধিকাংশ প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতবাদই বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিলীন হয়ে গেছে; আবার কোনো কোনো বস্তুবাদী মতবাদ বিলীন হওয়ার পথে। অথচ ইসলামবিদ্বেষী এ মতবাদধারীদের অধিকাংশের চৈতন্যোদয় হতে এখনোও বাকি।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আবার সেই ছদ্ম-একদলীয় শাসন ও ধর্মীয় বহুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু। সরকারি বিভাগগুলোতে নিখাদ দলবাজি, দুর্নীতি, বিচারহীনতা, খুন-গুম, কোষাগার ও ব্যাংক লুটপাট, নিজের ছেলেমেয়ে-আত্মীয়স্বজনসহ দলীয় লোকজনকে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থসম্পদ তৈরির সুবিধা করে বিদেশে পাচার করতে দেওয়া, ভারতীয় গোপন বাহিনী দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে দেশচালনা, গণহত্যা প্রভৃতি পুরোপুরি চলতে থাকে। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত স্বপ্ন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের হাত দিয়েই প্রভুর মনবাসনা প্রায় পূরণ হবার উপক্রম হলো। এরই ফলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে গণহত্যার রক্তে শেখ হাসিনার তক্ত কয়েকদিনের ব্যবধানে ভেসে চলে গেল। শেখ হাসিনা গং পালিয়ে গুরুর পদমূলে আশ্রয় নিল।

আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী কর্ম-চিন্তা দেখলে একে কোনো রাজনৈতিক দল বলা যায় না; এদের মধ্যে অন্য দেশের দালালী ও লুটপাট ছাড়া রাজনৈতিক কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের আওয়ামীলীগ নামে যে এদেশে কোনো দল ছিল, ভুলে যাওয়াই সমীচীন। তাই বলা যায়, হীন-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি কোনো দেশের এবং গণমানুষের মুক্তি কখনোই দিতে পারে না। কালক্রমে বিলীন হতে এবং মুখোশ উন্মোচিত হতে বাধ্য হয়। কেবল রসের ফোঁটা-চোষা চাটুকার-ভৃত্যরা তাদের বিলীয়মান নেতা-নেত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নিষ্ফল হা-হুতাশ ও কোলাহল করতে থাকে। লুটপাট ও দেশবিক্রির যে অপ্রকাশিত মূর্তিমন্ত নীলনকশা শেখ মুজিব এদেশের সাধারণ সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় মানুষের অলক্ষ্যে স্বীয় মনের কোণে তৈরি করেছিলেন, তার সুযোগ্য কন্যা অর্ধসমাপ্ত প্রতিমূর্তিতে রঙের শেষ প্রলেপ দিতে শতেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এটা স্বাধীনতা-পিয়াসী বাংলাদেশিদের প্রতি বিধাতার অশেষ কৃপা ও রহমত বলতে হবে।

এদেশে থেকে যত লক্ষ কোটি টাকা শেখ হাসিনা নিজে এবং নিজের লোক দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তার একটা অংশ অন্তর্বর্তী সরকার ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপ দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন এবং বিদেশে সরকারের নামে অপপ্রচার চালানোর কাজে লবিস্টদের নিয়োগে নিশ্চিতভাবেই ব্যয় হবে; হিন্দুত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী ভারতও এদেশ জঙ্গিদের অভয়ারণ্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের স্বকল্পিত বুলি বিদেশে অপপ্রচার করতে কোনো ত্রুটি করবে না। এতে মুসলিমবিদ্ধেষী মুরব্বিদের সমর্থনও নিশ্চয়ই পাবে; কারণ এটা বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের একটা অংশ। তাছাড়াও ভারত মুসলমানদের বহিরাগত শত্রু বলে সেই আদিকাল থেকে গণ্য ও প্রকাশ করে আসছে। তাদের পরীক্ষিত দাস ছাড়া কাউকেই তারা বিশ্বাস করবে না। এখন বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সে চৈতন্যোদয় সময়মতো হলেই হয়। বারবার পরীক্ষিত আওয়ামীলীগের দেশ-ধ্বংসাত্মক ও লেন্দুপ দর্জিমার্কা কর্মকাণ্ড এদেশের প্রতিটা দেশপ্রেমী মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে শংকিত করে তোলে।

বুঝতে হবে হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির দোসর এবং ধর্মবিদ্বেষী শক্তি এদেশের নব্বই শতাংশ মুসলমানের অস্তিত্ব ধ্বংসকারী ফ্যাক্টরের প্রতিভূ। এ ভূত যদি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে চেপে বসে, এ জাতির উন্নতির সব পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। তাই ইসলাম-বিদ্বেষী ভূতের প্ররোচণায় নিজেদের প্রশ্রয়ে নতুন দল গঠন প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়াই অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য শ্রেয়। অন্তর্বর্তী সরকারকে অজনপ্রিয় করার পেছনেও নিজেদের মধ্যে ও নির্বাহী

বিভাগে ছদ্মবেশী লোকজন সক্রিয়। সরকারের শুধু দেশ-সংস্কারসহ সদ্যকৃত গণহত্যার বিচার করাই যথেষ্ঠ হবে না; সব বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার, সব দুর্নীতিবাজের বিচারও করতে হবে। '৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের সাথে করা সকল চুক্তি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অবশিষ্ট দলগুলোকে আস্থায় এনে একজোট হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

(২১ জানুয়ারি '২৫ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web: pathorekhahasnan.com